মন এবং আত্মা জীবনের উৎকর্ষ লাভের জরুরি ও অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার দিগন্তকে বিস্তৃত করে। 'টেনে বের করা' বা 'জাগরিত করা' ('drawing out') শব্দবন্ধটির দ্বারা বোঝানো হয়, কোনও ব্যক্তির বিচিত্র ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত ও বর্হিমুখী একটি অনুশীলন। স্বামী বিবেকানন্দের মত অনুযায়ী, 'শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্গত উৎকর্ষের প্রকাশ।' তাই উৎকর্ষের দিক থেকে শিক্ষার ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ডিউই-এর শিক্ষা-ধারণার মূল কথা হলো শিক্ষার নির্যাস হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিকাশ। জন ডিউই শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে যে, শিক্ষা হলো কোনও ব্যক্তির সব সামর্থ্যের বিকাশ, যা তাকে তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করতে এবং তার সমস্ত সম্ভাবনাকে পূর্ণ করতে সহায়তা করে। সে শিক্ষাকে জীবনভর প্রক্রিয়া এবং পূর্ণতা ও উৎকর্ষ যা অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আসে, তার বাহন হিসেব চিহ্নিত করে। এই হিসেবে শিক্ষা হলো বেড়ে ওঠা ও উন্নত হওয়া।

## দর্শনের ধারণা

### দর্শন কী? দর্শনের মূল উপাদানগুলিই বা কী?

দর্শন ও শিক্ষা কি এক এবং অভিন্ন? অথবা ধারণাগত দিক দিয়ে তাদের কি কোনও পার্থক্য আছে? দর্শনকে সংজ্ঞায়িত করতে এবং শিক্ষার সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

দুটি গ্রিক শব্দ 'philos' (প্রেম) এবং 'sophia' (জ্ঞান বা প্রজ্ঞা) নিয়ে 'philosophy' (ফিলজফি) বা 'দর্শন' শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে দর্শন শব্দটিকে প্রজ্ঞার প্রতি প্রেম হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। প্রজ্ঞার প্রতি প্রেম হলো মানুষের ভেতর থেকে আসা পূর্ণতার অনুসন্ধান। দার্শনিক প্লেটোর কথায়, দর্শনের মহত্তম ও মূল উপাদান হলো চিন্তা। (১) কোনও ভাবনা বা অভিজ্ঞতা, তথ্য বা আবিষ্টতা না থাকে তবে দর্শনের উপস্থিতি বা প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। (২) জ্ঞান হলো সেই উপাদান যা সমস্ত আলোচিত চিন্তা ভাবনা ও অভিজ্ঞতার গুণগত ক্রমবৃদ্ধির দ্বারা দর্শনকে সমৃদ্ধ করে। (৩) প্রজ্ঞা দর্শনের অতীত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গঠন করে। এই কারণে প্রজ্ঞার প্রতি প্রেমই শেষ পর্যন্ত দর্শনের সংজ্ঞা হয়ে ওঠে। (৪) মনের মধ্যেকার অনুশীলন দর্শনের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে নিবিড় ভাবে কাজ করে। ভিতরকার চর্চা ছাড়া দর্শন নিছক তথ্যে পরিণত হয় এবং নিজস্বতা ভয়ংকর ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। (৫) দর্শন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমস্যাগুলিকে সামনে নিয়ে আসে, যা ব্যক্তিত্বের শক্তির সাহায্যে মোকাবিলা করতে হয়। এই কারণে জ্ঞানতত্ত্ব হলো দর্শনের একটি শক্তিশালী উপাদান যা খতিয়ে দেখে ভুল কী সেই প্রসঙ্গে, সঠিক কী সেই প্রশ্নকে এবং তার বিপরীতক্রমকে। (৬) সত্তাতত্ত্ব (ontology) বা অস্তিত্বের প্রকৃতি সম্পর্কিত অধিবিদ্যার শাখাটি দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। জীবনে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো কার্যকারণ সম্পর্কটিকে চিহ্নিত করা। (৭) দর্শন এ কারণেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। মূল্যবোধের উপজীব্য সমূহ, যা স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের (axiology) অন্তর্ভুক্ত, তা হলো সৌন্দর্যতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা এবং নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রধান বিচার্য বিষয় এবং সেগুলি পূর্ণতার শিক্ষায় বিশাল অবদান রাখে। এভাবে দর্শনের বিভিন্ন ধারণার সন্ধান পেলাম।

## শিক্ষা ও দর্শন

### শিক্ষা ও দর্শন কি পৃথক বিষয়?

আপাত অর্থে পৃথক, কিন্তু এটাও সমভাবে সত্য যে শিক্ষা ও দর্শন এক ও অভিন্ন কারণ সহজভাবে বললে তারা একই মুদ্রার দুটি পিঠ। যদি শিক্ষা সমস্ত জীবন ধরে চলা একটি প্রক্রিয়া হয়, তবে তা দর্শনকে এড়িয়ে যেতে পারে না, কারণ দর্শনই জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও শক্তিশালী করে। এটি জীবনের একটি সক্রিয় অংশ। পরেরটি

Copyrighted mater

হলো বিভিন্ন ভাবনাকে অনুভব করার মাধ্যম। এইভাবে শিক্ষা যেমন ক্রিয়াকলাপ ও কার্য সম্পাদনের দিক দিয়ে জীবনের সক্রিয় ও ব্যাবহারিক অংশ, দর্শন তেমনি জীবনের চিন্তাশীল এবং তাত্ত্বিক দিক যা প্রথমটির দৃষ্টিশক্তিকে সমৃদ্ধ করে। যেহেতু কর্ম ও ভাবনা দর্শন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে হাত ধরাধরি করে চলে, তাই তারা পরস্পর নির্ভর ও একে অন্যের পরিপূরক।

শিক্ষার দর্শন সংগতিপূর্ণ ভাবে জীবনের তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতাকে বহন করে, যেখানে সমস্ত অভিজ্ঞতার সত্যতা প্রতিপন্ন হয় ব্যাবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে এবং তার একটি যথার্থ দার্শনিক প্রেক্ষাপট থাকে। ডিউই-এর পর্যবেক্ষণ অনুসারে, 'শিক্ষা হলো দর্শনের গবেষণাগার, যেখানে দার্শনিক সত্যের যুক্তিগ্রাহ্যতা পরীক্ষিত হয়।' উপরন্তু এর লক্ষ্য হলো মানবিক অভিজ্ঞতার নিরবচ্ছিন্ন পুনর্গঠন যেখানে দর্শন সমাজ ও পরিবেশের সূত্রে ভাবনা, ধারণা, চিন্তা, অনুভূতি ও আবেগ সমূহের রূপদান ও পুনর্নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই বিষয়টিকে ডিউই এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: জীবন হলো অভিজ্ঞতার নিরবচ্ছিন্ন পুনর্নির্মাণের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকার এক প্রক্রিয়া। এটি ব্যক্তিমানুষের সমস্ত ধীশক্তির উন্নয়ন যা তাকে সম্মানীয় করে তোলে প্রতিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও তার সমস্ত সম্ভাবনাকে পূর্ণ করে তুলতে।'

দর্শনের শক্তিশালী সমর্থনের দ্বারা শিক্ষা সত্যিকারের কার্যকরী হয়ে ওঠে। দর্শন হলো যে শিক্ষার দর্পণ যার মধ্যে দিয়ে ধারণাগত ও ব্যাবহারিক অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়। আবার, এটাই হলো সত্যের প্রাণসত্তা যা শিক্ষাকে যেসব তত্ত্ব বাস্তবে পরিণত হয়, তাদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়ে উঠতে সাহায্য করে। ঘটনা এই যে শিক্ষা ও দর্শন বিদ্যাচর্চার আলাদা শাখা রূপে গণ্য হলেও কর্ম ও ব্যাবহারিক দিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত।

## শিক্ষার দর্শন: ধারণা ও লক্ষ্য

### শিক্ষার দর্শন কী?

শিক্ষাদর্শন অপরিহার্য ভাবে শিক্ষার বিভিন্ন অভিব্যক্তির দর্শন। শিক্ষার বিভিন্ন ক্রিয়াশীল দিক যেমন বিভিন্ন বিবেচনা, তত্ত্ব, ভাবনার দ্বারা শিক্ষা সমৃদ্ধ হয় এবং যেগুলি শিক্ষার কর্মপথকে নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলিই শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

শিক্ষাদর্শন নিয়ে কথা বললে প্রাথমিক ভাবে শিক্ষাকে স্বল্প কথায় এই তিনটি মাত্রায় প্রকাশ করা যায়—সত্তাতত্ত্বীয়, স্বতঃসিদ্ধতত্ত্বীয় ও জ্ঞানতত্ত্বীয়। সত্তাতত্ত্বীয় ধারণায়, শিক্ষাদর্শন শিক্ষার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রকৃত অন্তদৃষ্টিকে পথ দেখায়। এভাবে দেখলে, শিক্ষায় জ্ঞানের দর্শন দার্শনিক জিজ্ঞাসার বিশাল প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর ও উন্নততর রূপ পরিগ্রহ করে। একজন

ব্যক্তি-শিক্ষার্থীর বিদ্যাচর্চাকে যদি আমৃত্যু অনুশীলন বা বংশানুক্রমিক পরিপ্রেক্ষিতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তবে দর্শনকে স্বাভাবিক ভাবেই জ্ঞানতত্ত্বের চর্চা বলা যায়।

আবার দর্শনের অন্য দুটি দিক যেমন সত্ত্বাতত্ত্বীয় বা স্বতঃসিদ্ধতত্ত্বীয় শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনসাধক, বিশ্লেষণমূলক এবং প্রগতিশীল রূপ নিয়েছে। তাই এই চর্চাটি আর নিষ্ক্রিয়তা ও তত্ত্বের মধ্যেই আবদ্ধ নেই, বরং এখন তা হয়ে উঠেছে সক্রিয় ও উন্নতিশীল। এখন উৎকর্ষের অনুশীলনে অংশগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা লাভ শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে অভিন্ন।

যদিও সনাতন দর্শন শ্রেণিগত দর্শনের প্রতি অনুরাগী। বিশ্লেষণাত্মক অথবা বিশ্লেষণাত্মক-উত্তর দর্শন শিক্ষাদর্শনকে আহ্বান করে দার্শনিক ও প্রয়োগবাদী অনুসন্ধানের পার্থক্য দূর করে বেরিয়ে আসতে। এটি বর্তমানে শিক্ষাদর্শনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় মূল্যবোধ, সমালোচনা, মূল্যায়ন, সৃজনশীলতা এবং সৌন্দর্যতত্ত্বের নতুন নতুন পন্থায় চর্চা চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

একাদশ শতাব্দীতে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা, মানবাধিকার শিক্ষা, কমপিউটার- ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা, চাপ ও ধকল সংক্রান্ত শিক্ষা (Strees and strain education) উপগ্রহ শিক্ষা প্রভৃতি উত্তর আধুনিক বিষয়ের শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে সম ছন্দের নতুন নতুন পন্থা উন্মোচিত করে চলেছে শিক্ষাদর্শন।

সমাজতাত্ত্বিক মাপকাঠিতে বিচার করলে শিক্ষাদর্শন তাৎপর্যপূর্ণভাবে সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে একটি যোগসূত্র যা দর্শনের মৌলিক দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে ছন্দসমতাপূর্ণতাকে পরিচিত করেছে। তাই শিক্ষাদর্শন বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি ও পরিধি সম্পন্ন শিক্ষার বিভিন্ন শাখার মাতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

## শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্যসমূহ

শিক্ষাদর্শনের কিছু স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক লক্ষ্য রয়েছে। যেহেতু একে সমস্ত শিক্ষা-বিষয়ের মা বলে বিবেচনা করা হয়, তাই এটি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দিক থেকে বিভিন্ন শিক্ষা-বিষয়ের লক্ষ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে।

শিক্ষা হলো একটি প্রয়োগিক সমাজবিজ্ঞান। এটি কেবলমাত্র কয়েকটি তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। একজন ব্যক্তিমানুষের আচরণকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যাতে সমাজ ও সেই ব্যক্তি উভয়ই উপকৃত হতে পারে শিক্ষাদর্শনের এক্তিয়ারভুক্ত। মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, রাশিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদর্শন তার পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। ফলে, এটি মানবজ্ঞান, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সভ্যতার বিভিন্ন মতাদর্শের বিশাল সমাবেশকে বেষ্টন করে থাকে যাতে মানবসমাজ দৃঢ় পদক্ষেপে উন্নতি ও উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

শিক্ষার  লক্ষ্যসমূহ এমন হওয়া দরকার, যা মনের বৈপ্লবিক এবং উদ্ভাবনমূলক পরিবর্তনের ঝরনাধারা নিয়ে আসে, কোনও বদ্ধ জলাশয় নয়। মানুষের মন হলো গায়কপাখির ঠোঁটের মতো, সর্বদা আত্মপ্রকাশের মহার্ঘ্য সহায়তা করে। শিক্ষার কাজ হলো প্রতিটি ব্যক্তিকে তার মনের প্রতিটি কোণায় প্রবেশের সুযোগ দেওয়া, অর্থাৎ সংস্কৃতি ও সর্বদিক থেকে উন্নতির অনুশীলনে মনকে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেওয়া।

তাই, শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য হলো সমাজবিদ্যা, দর্শন, মানসিক স্বাস্থ্য, রাশিবিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্ব ও পাশাপাশি মানবোন্নতির বিভিন্ন শাখার বিদ্যা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একটি স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত, প্রগতিশীল, সুসংবদ্ধ এবং আকর্ষণীয় উন্নতিকে প্রকাশ ও পরিব্যপ্ত করা। দর্শনে যেমন আদর্শবাদ, প্রয়োগবাদ, প্রকৃতিবাদের মতো ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তেমনি শিক্ষাদর্শনে সমাজবিদ্যা ও মানসিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের শিখন ও শিক্ষণের মাধ্যমে ভালো নাগরিক ও সুমানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা নিশ্চিত করার চর্চা চালানো হয়। আবার, শিক্ষাবিজ্ঞান নির্ধারণ করে রাশিবিজ্ঞান ও মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, একটি শিশু কতটা শিখেছে এবং কেমন করে তার প্রকাশ ও কাজের আচরণের ধরনের মূল্যায়ন করা হবে। এইভাবে মনোযোগ, আগ্রহ, স্মৃতি, দক্ষতা, বোঝাপড়া, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিগত পার্থক্য, ব্যক্তিত্ব, প্রেষণা প্রভৃতি বিষয়গুলি নিবিড় ভাবে শিক্ষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক শিক্ষাবিজ্ঞানে অনুশীলন করা হয়।

যেহেতু শিক্ষাবিজ্ঞান একটি উদ্দেশ্যসাধক ও সচেতন কার্যক্রম তাই তা শিখনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও শিক্ষার লক্ষ্য বিষয়ক সমস্ত বৈপ্লবিক চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে অভ্যর্থনা করে, আর তাই, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজ সমূহের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার দিকে নজর রেখে শিক্ষক শিক্ষার লক্ষ্যকে নির্ধারণ করেন।

শিখনের জন্য আগে থেকে সুবিবেচনা সম্পন্ন চিন্তা দরকার। ভাবনা ও চিন্তা ছাড়া শিখন হলো পণ্ডশ্রম। আবার চিন্তাবিহীন শিখন অর্থহীন ও বিপজ্জনক। শিখন ও চিন্তার মধ্যে কেমন করে একটি প্রত্যয়জনক আবহাওয়া সৃষ্টি করা হবে তা শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাবিজ্ঞান হলো জ্ঞানের ব্যবহার ও চর্চা সংক্রান্ত শিক্ষা। এর অর্থ এই নয়, যে-সমাজের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সংযোগ রয়েছে তা জ্ঞানচর্চা থেকে বঞ্চিত। সমাজের জন্য শিখন হলো যথাযোগ্য জীবনযাপনের শিখন। মানুষের বেড়ে ওঠার বিভিন্ন অবস্থা। যেমন একেবারে ছোটো অবস্থা, শৈশব, বয়ঃসন্ধি, পরিণত সাবালকত্ব প্রভৃতির প্রয়োজন সহযোগিতা ও সুসমঞ্জস্যতা বৈশিষ্ট্য এবং ধারাবাহিকতা, যেগুলি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শিক্ষাবিজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন

এলাকার চর্চা। শিক্ষাবিজ্ঞানে শেখানো হয় আত্মকর্মে নিয়োগের কথা। অন্যদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হতে হলে নিজের প্রতি কতটা ন্যায়পরায়ণ হতে হয়। নিজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি কেমন করে চিহ্নিত করতে হয়? নিজেকে বিকশিত করার জন্য কেমন করে সবচেয়ে ভালো পথগুলি বেছে নিতে হয়? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে অন্যদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার জন্য কীভাবে নিজেকে নানা উপকরণে সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত করে তুলতে হয়। এই সমস্ত এবং অন্য সংযুক্ত নানা জিজ্ঞাসা শিক্ষাবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। মানিয়ে নেওয়া এবং অন্যদের স্বার্থপূরণের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষাবিজ্ঞান মানসিক, প্রাকৃতিক বা ভৌত ও সামাজিক—এই তিনটি বিভিন্ন পরিবেশের প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে চর্চা করে। শিক্ষা ও জীবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষ কীভাবে চোখ, কান, নাক, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন করে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা হলো এই সব দৈহিক প্রত্যঙ্গের সচেতনতার উদযাপন, যাদের ছাড়া জীবন তার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে। শিক্ষার এই দৃষ্টিকোণ মানুষকে মানিয়ে নিতে, উন্নতি করতে এবং আদর্শ ভৌত পরিবেশকে পরিচর্যা করতে সাহায্য করে।

বৃদ্ধি ও উন্নতির ধারক হিসেবে শিক্ষার উচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি ইতিবাচক শক্তির প্রবেশ ঘটিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা। শিক্ষার্থীর ভূমিকা নিশ্চিতভাবে এমন হওয়া দরকার যা সামঞ্জস্যতা ও শৃঙ্খলতাবদ্ধতার মাধ্যমে প্রগতিশীল ভাবে এক সারি পরিবর্তনের উদ্ভব ঘটাতে পারে। এতে শিক্ষা হয়ে ওঠে নমনীয় ও পরিবর্তশীল, গতিশীলতা ও পরিণতি প্রাপ্তির প্রতীক। যেহেতু শিক্ষা হলো একটি ধারাবাহিক প্রণালী, সে কারণে উচিত কতগুলি লক্ষ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা:

(১) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সবচেয়ে ভালো দিকটির প্রকাশ ঘটানো এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় সমস্ত ব্যক্তিগত পার্থক্য আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া।

(২) প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর উন্নতির সাধারণ মান মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন উপাদান যেমন বুদ্ধিবৃত্তি, আচরণ, প্রক্ষোভ, প্রেষণা প্রভৃতির নিরিখে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করে দেখা উচিত।

(৩) শিক্ষা হলো পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলা। পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে শিশুর মানিয়ে চলার ক্ষেত্রে সে নিজেকে কতটা উপযোগী করে তুলতে পারে। তারই সর্বদা জীবন্ত পরীক্ষানিরীক্ষা হওয়া দরকার শিশুশিক্ষাতে। যেহেতু শিক্ষা হলো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মানিয়ে চলা, শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলা, চারপাশের প্রত্যেকের সঙ্গে মানিয়ে চলা, তাই প্রয়োজন সামাজিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক, সৌন্দর্যবোধক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির পাশাপাশি আত্মকর্ম, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্ম-যুক্তি ও আত্ম-আবিষ্কারের সৃজনশীল অনুশীলন।

(৪) যেহেতু সামাজিক অভ্যাসের সমস্ত প্রকাশের সঙ্গে সংস্কৃতি জড়িয়ে থাকে সেহেতু সমাজের মধ্যে সংস্কৃতির মূলসূত্রকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার একটি ভূমিকা আছে। সেই সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পরিব্যাপ্তি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষার লক্ষ্য প্রাথমিকভাবে আর্থ-সামাজিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ সমৃদ্ধকরণ ও পরিবর্তনের দায়িত্ব নেওয়া এবং ভালো ব্যবহারকে তুলে ধরা ও নিশ্চিন্ত করা, ব্যক্তিত্বের বিশুদ্ধকরণ এবং বিশেষত নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক, নৈতিক ও নীতিগত পরিবর্তনের একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করা প্রভৃতিতে বিশেষ আগ্রহ দেখানো।

(৫) শিক্ষা হলো উৎকৃষ্ট নাগরিত্বের প্রশিক্ষণ ও চর্চা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো বিশ্ব নাগরিকত্বের সুস্পষ্ট অর্থকে তুলে ধরা। এর জন্য ব্যক্তিত্বে উন্নতি, উৎকৃষ্ট নাগরিকত্ব, সংস্কৃতির বিভিন্ন কৌশলের সমৃদ্ধকরণ, যা প্রেষণা নিয়ে আসে যা কিছু মহৎ, সত্য ও ভালো তার থেকে, তাদের অগ্রবর্তী করে তোলা উচিত।

(৬) শিক্ষার লক্ষ্য হলো তাৎপর্যপূর্ণ, উদ্দেশ্যপূর্ণ ও কার্যকরী সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক উন্নতিকে ঘটানো। শিক্ষার দিক থেকে বিচিত্র সম্পর্কের ধরনের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার সামাজিক পরিমণ্ডলের চর্চাকে অন্তর্ভুক্ত

করা হয়: (ক) ভৌত পরিবেশ; (খ) সাংস্কৃকি বৈচিত্র্য, বিচ্ছিন্নকরণ ও ঐক্যতান প্রভৃতি; (গ) জীবগত জৈবিক উপাদান; (ঘ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিবর্তন; (ঙ) বৈজ্ঞানিক বিস্ময় ও পরিবর্তন সকল; এবং (চ) বিভিন্ন সংগঠনগত প্রভাব।

(৭) যেহেতু শিক্ষা হলো সামাজিক প্রগতি, সংস্কার ও সচেতন ভাবে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির প্রধান কর্মপদ্ধতি যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের ধরনের পরিবর্তনকে নিশ্চিত করে। তাই একে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলির প্রয়োজন ও দাবিকে তুষ্ট করা উচিত: (ক) সার্বজনীন ও মুক্ত শিক্ষা; (খ) জনশিক্ষা; (গ) নেতৃত্বের জন্য শিক্ষা; (ঘ) পরিবেশ শিক্ষা; (ঙ) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের শিক্ষা; (চ) নারীশিক্ষা; (ছ) শিশুর যত্ন ও পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষা; (জ) অন্য ভাবে গুণসম্পন্ন হওয়ার শিক্ষা; (ঝ) সৎ নাগরিক হওয়ার শিক্ষা।

(৮) যেহেতু শিক্ষা হলো দ্বিমেরু যুক্ত পদ্ধতি যেখানে প্রতি ব্যক্তির উচিত তার অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্বে ভাগ নেওয়া, তার উচিত মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিকীকরণের একটি অনুকূল বাতাবরণ তৈরি করা। সামাজিকীকরণের জন্য শিক্ষাপদ্ধতির উচিত সীমাবদ্ধকরণ, সহযোগিতা, মানিয়ে নেওয়া, সহানুভূতি ও প্রতিযোগিতার পদ্ধতিগুলিকে ব্যবহার করা। এর উচিত খাপ খাইয়ে নেওয়ার শিক্ষা, সহিষ্ণুতা, গণতন্ত্র, আমরা-বোধ ও সংহতির পাঠক্রমগত ও সহ-পাঠক্রমগত অনুশীলনের সুযোগ তৈরি করা।

(৯) শিক্ষার উচিত বিদ্যালয়কে এমন এক সমর্পিত প্রতিনিধি হিসেবে তৈরি করা যা 'সরলীকৃত, বিশুদ্ধ এবং আরও ভালোভাবে ভারসাম্যযুক্ত সমাজ'-কে প্রতিনিধিত্ব করে। যেহেতু বিদ্যালয় হলো ক্ষুদ্র সমাজের প্রতিনিধি যা সমাজে অবস্থানরত 'আবশ্যক সাংস্কৃতিক দিকগুলি'কে গতিশীল করে, তাই শিক্ষার উচিত দ্বন্দ্ব-বিশ্লেষণ, আত্তীকরণ, সাংস্কৃতিক অভিযোজন ও জাতির প্রসারণকে লক্ষ্য হিসেবে রাখা। শিক্ষার লক্ষ্যের আওতার মধ্যে পড়ে কেমন করে ব্যক্তিগত ও সমাজগত লক্ষ্যের মধ্যে একটি বাস্তবোপযোগী এবং সন্তোষজনক ভারসাম্য আনা যায়। যেহেতু শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, তাই প্রাথমিক অর্জন হলো স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্য দিয়ে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি সৃষ্টি করা। শিক্ষামূলক চিন্তা ভাবনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার দেওয়া উচিত এমন একটি নতুন স্ফূরণ যাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আনন্দের অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর গঠন ও রূপ দান ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষার শেষ অর্জন হলো শিক্ষার ব্যক্তিগত ও সামাজিক লক্ষ্য নির্মাণ।

শিক্ষার যে লক্ষ্যগুলির কথা বলা হলো, সেগুলি ছাড়াও শিক্ষার আরও কতকগুলি লক্ষ্য আছে, যাদের গুরুত্ব না দিয়ে থাকা যায় না। এগুলি হলো—

(১) সঠিক ভাবে বাঁচা, (২) বৃত্তি, (৩) নৈতিক এবং নীতিশাস্ত্র, (৪) আধ্যাত্মিক, (৫) পার্থিব বিষয়গুলির চর্চা, (৬) সঠিক অবকাশ যাপন।

শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির পূর্ণতার সঙ্গে বেঁচে থাকা। পূর্ণতার সঙ্গে বাঁচার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা পূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বেঁচে থাকার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিকে সাহায্য করে, গড়ে তোলে ও উৎসাহ দেয় যথাযোগ্য অভিমত প্রকাশ করতে। এর আদর্শ মন্ত্র হলো, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যত্ন নেওয়া এবং নিজের যত্ন নেওয়া। কেমন করে ব্যক্তির অন্তর্লীন ক্ষমতাসমূহকে প্রকাশ করা যায় তাই হলো পূর্ণতার সঙ্গে বাঁচার জন্য শিক্ষার অনুসন্ধান। এই জন্যই মানবতার চৈতন্যের প্রয়োজন হয় অনুশীলনের। এই প্রেক্ষাপটেই শিক্ষার দরকার পড়ে নির্দিষ্ট যত্ন ও মনোযোগের। শিক্ষার বৃত্তিগত লক্ষ্যের কথা ধরলে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তির বৃত্তিগতকরণের দিকে কাজকর্মের অভিমুখকে নির্দিষ্ট করতে হয় এবং স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নজর রাখতে হয়। বৃত্তিগত শিক্ষাকে এতটাই বৈশিষ্ট্যযুক্ত হতে হয়, যাতে তা কাজে লাগাতে পারে সবচেয়ে ভালো কার্য অভ্যাসকে এবং এর মাধ্যম হয় ব্যক্তিত্বের গুণগত গতিবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ। এই ব্যাপারে একটি যথাযথ সতর্কীকরণ থাকা দরকার, যাতে কারখানা বা কর্মশালা গড়ে তোলার পরিবর্তে জগৎকে একটি আদর্শ মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

শিক্ষার নৈতিক, নীতিশাস্ত্রগত ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমূহের প্রয়োজন হলো যথেষ্ট ও যত্নশীল অনুশীলন। এই ধরনের শিক্ষা শেখানো যায় না, তা নিজেকে ধরে নিতে হয়। পাঠক্রম এমন করে গড়ে তোলা যেতে পারে যাতে এই সমস্ত লক্ষ্যগুলি ঠাঁই পায়, যেগুলি বর্ধিষ্ণু ও সব কিছু ঘিরে থাকা গণতন্ত্রের জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে সবচেয়ে ভালোভাবে চিহ্নিত করা যায়, মানসিক প্রশিক্ষণ অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে। শিখনের রূপান্তর ও অনধিগম্যতা হলো এমন উপাদান যা একই সঙ্গে প্রেম ও জ্ঞানের দিকে এগিয়ে দেয়, যখন শিক্ষার দর্শন হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ ও সঠিক।

শিক্ষা হলো বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, সনাক্তকরণ ও যুক্ত হওয়া, উৎকর্ষ ও পূর্ণতার ক্ষেত্রের ধ্রুবতারা। সঠিক মন, সঠিক সম্প্রদায়, সঠিক সমাজ এবং সঠিক পৃথিবীর বিকাশের জন্য শিক্ষা হলো একটি সমাপ্তিহীন প্রক্রিয়া। মানবজাতির বৃহত্তর মহত্তর যাত্রার জন্য ব্যক্তি ও সমাজ শিক্ষার সঙ্গে একীভূত হয়।

## পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদর্শন

শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পূর্বে যা ছিল তা-ই, শিক্ষাগত উদ্যম। একই সঙ্গে কোনও পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা এবং গঠনের ক্ষেত্রে দর্শনকে উপেক্ষা করা চলে না।

পাঠ্যক্রম কী? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কী? একটি পাঠক্রম গঠন করতে গেলে কী আদর্শ অনুসরণ করা উচিত? ভালো পাঠ্যসূচির চিহ্নগুলি কী? এই সমস্ত এবং আরও অন্য প্রশ্নসমূহ দর্শনের সঙ্গে পাঠ্যক্রমের ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককেই প্রতিষ্ঠা দেয়।

একটি পাঠ্যক্রম হলো বিষয় ও কার্যক্রমের সমন্বয়। পাঠ্যক্রমের বিষয় ইঙ্গিত করে সেই তত্ত্ব ও নীতির প্রতি যেগুলি দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কার্যক্রম বলতে বোঝায় কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্র যা আবার ইঙ্গিত করে দর্শনের ভূমিকার প্রতি।

এটা স্বীকার্য, পাঠ্যক্রমের গঠনের জন্য কিছু নীতি থাকা দরকার। নীতিগুলি গড়ে তোলার জন্য, দর্শন নির্ধারণ করে কিছু কৌশল ও অভিগমনকে যেগুলি খুব ভালো ভাবে প্রকৃতিবাদ, আদর্শবাদ, প্রয়োগবাদ ও বাস্তববাদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। চর্চার ক্ষেত্র ও পাঠ্যক্রম নির্বাচন হলো একটি দর্শনগত কাজ। কী শেখাতে বা শিখতে হবে? শিক্ষার্থী শিখনের যে ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করবে তা কীভাবে চিহ্নিত হবে? জ্ঞান, বোঝাপড়া, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যায়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন্ ব্যাপারগুলি অগ্রাধিকার পাবে? এই সমস্ত প্রশ্নগুলি একটি ভালো পাঠ্যক্রম গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত, যে পাঠক্রমের অভিপ্রায় করে একটি প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরা তা দর্শনগত না হয়ে থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করে একটি সুস্পষ্ট, নির্দিষ্ট, বাস্তব ও সোজাসুজি প্রকাশভঙ্গি—কেমন করে দৃষ্টিভঙ্গির দার্শনিক স্বচ্ছতার সঙ্গে পাঠ্যক্রম গড়ে তোলা যায়।

একটি ভালো পাঠ্যক্রম চিহ্নগুলি সনাক্ত করার ক্ষেত্রে আমরা কিছু আগ্রহের বিষয়কে লক্ষ করা হয়। প্রথমত, একটি পাঠ্যপুস্তককে বিবেচনা করা। এটা অস্বীকার করা যায় না সঠিক পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে দর্শনের একটি অকৃত্রিম ভূমিকা থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, বিবেচিত পাঠ্যক্রমের বিষয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা যার ভিত্তি হলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ এবং সেগুলি অপরিহার্যভাবে দর্শন-নির্ভর হয়। উদাহরণ স্বরূপ, সম্প্রদায়ের মধ্যে একত্রে বসবাস, সামাজিকীকরণ, প্রেষণা, নিয়মানুবর্তিতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক কর্মসূচির মাধ্যমে চর্চা করা হয় এবং সমৃদ্ধ হয় দৃষ্টিশক্তির দার্শনিক গভীরতার দ্বারা। তৃতীয়ত, সৃষ্টিশীল ও সমালোচনামূলক প্রস্ফুটনের জন্য একটি পাঠ্যক্রম তৈরিতে দর্শনের একটি ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই ভূমিকাটি হলো অন্তরের পুনর্ব্যবহার ও ভাবনাচিন্তা, অনুসন্ধান ও উদ্ভাবনের দর্শনের ভূমিকা। চতুর্থত, সেই পাঠ্যক্রম যা শিক্ষার্থীর পার্থিব চৈতন্য ও সৌন্দর্যতত্ত্বগত

সংবেদনশীলতার প্রতি যত্ন নেয় এবং তাকে সমৃদ্ধশালী করে, আর সর্বদা দর্শন দ্বারা সমর্থিত হয়। পঞ্চমত, যে-কোনও ভালো পাঠ্যক্রম ব্যক্তিকে আত্ম-উপলব্ধির দিকে এগিয়ে দেয়, যেখানে সমস্ত শিখন আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষের দিক থেকে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

এটা ঘটনা যে, ভালো পাঠ্যক্রমের চিহ্নগুলি সর্বদা দর্শনের স্নেহশীল যত্ন ও অভিভাবকত্বে পরিচর্যিত হয়। পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তিই তার গুণ ও দোষ, সুবিধা ও অসুবিধা নির্ধারণ করে। একটি নিখুঁত পাঠক্রম হলো দর্শনের একটি নিখুঁত প্রতিভূ এবং এর বিপরীতক্রম।

## 'দর্শন' ও 'শিক্ষা'র তাৎপর্য

দর্শন হলো চিরন্তন সত্যান্বেষণ। বিস্ময়বোধ বা কৌতূহলের মধ্যেই নিহিত আছে দর্শনের উৎস। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের মতোই পুরানো এর অস্তিত্ব। দর্শনের বিষয়-বিস্তৃতির মানবজীবনের অভিজ্ঞতার মতোই বিস্তৃত। ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) মনে করতেন দর্শনই হলো বিজ্ঞানের সব শাখার জননী।

দর্শন শব্দটির ইংরেজি 'philosophy' (ফিলজফি) শব্দটি এসেছে গ্রিস থেকে। গ্রিক শব্দ 'philosophia' (ফিলজফিয়া) সৃষ্টি হয়েছে দুটি শব্দ থেকে। এগুলি হলো 'phileo' (ফিলেয়ো) যার অর্থ ভালোবাসা এবং 'sophia' (সোফিয়া), যার অর্থ প্রজ্ঞা (wisdom)। তাহলে ফিলজফি (দর্শন)-র আক্ষরিক অর্থ দাঁড়াল প্রজ্ঞার ভালোবাসা (Love of wisdom)। প্রজ্ঞা (wisdom) কেবলমাত্র জ্ঞান (knowledge) নয়। কোনও ব্যক্তির জ্ঞান থাকলেও তিনি প্রজ্ঞাবান না হতেও পারেন। প্রজ্ঞা হলো জ্ঞান এবং যে-কোনও পরিস্থিতিতে তাকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা।

কয়েকটি সংজ্ঞা নিরূপণ বিষয় 'দর্শন' শব্দটিকে আরও স্বচ্ছ ভাবে বোঝার জন্যে—

(১) প্লেটোর বক্তব্য অনুযায়ী—'বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃত স্বভাব বা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান হলো দর্শন।'

(২) রাধাকৃষ্ণাণের ধারণা অনুযায়ী দর্শন হলো 'বাস্তবতার প্রকৃতি বিষয়ক যৌক্তিক অনুসন্ধান।'

(৩) হেন্ডারসনের মত অনুযায়ী দর্শন হলো এমন এক অনুসন্ধান যা 'প্রকৃতিকে এক সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টির মাধ্যমে দেখা, বস্তুর প্রকৃতির এক সর্বজনীন ব্যাখ্যার উপস্থাপন করে।'

দর্শন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে বুঝে নিতে চায়। দর্শনের কাজ হলো মানুষের মন এবং ব্যাক্তিত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে চর্চা করা। প্লেটো (৪২৭–৩৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) দার্শনিককে সংজ্ঞায়িত করেছেন—'এমন একজন মানুষ যাঁর জ্ঞানের সব শাখার প্রতিই অনুরাগ আছে এবং যিনি শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগ্রহী এবং কখনওই সন্তুষ্ট হন না, তাঁকে দার্শনিক বলে অভিহিত করা চলে।' একজন দার্শনিক কখনোই সন্তুষ্ট হন না এবং সর্বদাই সত্যের দিকে ছুটে চলেন। একজন দার্শনিক মনুষ্যজগতের সম্পূর্ণ বৃত্তান্তকে উপস্থিত কথার প্রয়াস করে চলেন সর্বদাই। দর্শন একেবারে সভ্যতার সূচনা থেকেই মনুষ্যজাতির সাধারণ সমস্যাগুলি আগ্রহের চোখে দেখেছে এবং সাহায্য করেছে প্রজ্ঞা অর্জনে, যা জীবনাযাত্রাকে প্রভাবিত করে।

'জীবনের দর্শন' এই বাক্যবন্ধ দ্বারা আমরা বোঝাই 'জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি', অর্থাৎ কীভাবে আমরা বস্তু, ঘটনা, সম্পর্ক এবং মূল্যবোধসমূহকে বিবেচনা করি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ সম্পদ অর্জনকে, কেউ স্বাস্থ্য অর্জনকে আবার কেউবা ক্ষমতা অর্জনকেই উচ্চ মূল্য দিয়ে থাকে। এগুলিই হলো তাদের জীবনের দর্শন।

মহান গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (৩৪৪–৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রত্যেকেই এক দর্শনকে অনুসরণ করে চলে, তা সচেতন ভাবেই হোক বা অচেতনভাবে।'

দর্শন জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এগুলি হলো—(১) অধিবিদ্যা, বাস্তবতা সংক্রান্ত তত্ত্ব (Metaphysics, theory of reality); (২) জ্ঞানতত্ত্ব, জ্ঞানসংক্রান্ত তত্ত্ব (Epistemology, theory of knowledge); (৩) স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব, নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

Copyrighted material